নিরস্ত্রীকরণের অর্থনীতি : নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন

সেলিম জাহান*

১. ভূমিকা

'নিরস্ত্রীকরণ' বিষয়টির নানান আঙ্গিক আছে—এর একটি রাজনৈতিক দিক আছে, এর একটি আথিক বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বিদ্যমান এবং এর সমাজ-বিষয়ক প্রভাবগুলোও ভেবে দেখার মত। তবে সে সঙ্গে এ কথাটিও সত্য যে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারটিকে আমরা রাজনৈতিক একটি বিষয় হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এর রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিই বেশী আলোচিত, সমালোচিত, ও বিতর্কিত হয়। কিন্তু যে কথাটি সবসময়ে মনে রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানেই হচ্ছে বিপুল সম্পদের অপচয়, যে সম্পদকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগালে একটি এ পুরো বিশ্বের চেহারাটাই বদলে যেতে পারে। সারা বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষ যেখানে অনাহার আর দারিদ্র্যের শিকার, সেখানে সহস্র কোটি টাকার সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলতে, যে ভাণ্ডার মানব জাতির কোন উপকারে আসবে না। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ এ বিপুল আথিক ও মানব সম্পদের অবমুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্কটি নির্ণয় করা। এ মুখ্য লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধটির বিন্যাস নিম্নোক্ত উপায়ে করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে একটি প্রেক্ষাপটমূলক আলোচনা হিসেবে বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে যে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করা হবে। এর অনুগামী অংশে বিশ্বের যে

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিপুল সম্পদ অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্য ব্যয় করা হয়, তার একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরতে আমরা প্রয়াসী হব। নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান, প্রবন্ধের চতুর্থ অংশে তা চিহ্নিত করা হবে। প্রবন্ধের পঞ্চম অংশে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব এমনকি সীমিত নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেও অনুন্নত বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কতখানি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। কিছু উপসংহারমূলক মন্তব্যের মাধ্যমে প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানা হবে।

নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক অসুবিধে বিদ্যমান—সেটা হচ্ছে অস্ত্রভাণ্ডার ও সামরিক ব্যয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য উপাত্তের অনুপস্থিতি। অনুন্নত দেশগুলোতে সাধারণভাবেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের ক্ষেত্রে উপাত্ত-সমস্যা রয়েছে; সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও প্রকট। এর অন্যতম কারণ, এ সব দেশের সরকার ও প্রশাসন সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে প্রচণ্ডরকমের গোপনীয়তা অবলম্বন করে। এর কারণ হিসেবে অবশ্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটি দেখানো হয়, তবে সে যুক্তি খুব একটা জোরালো নয়। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা ও বিশ্লেষণও এ সীমাবদ্ধতা নিরপেক্ষ নয়। লভ্য উপাত্তের ভিত্তিতেই আমরা বিভিন্ন উপসংহারে উপনীত হতে প্রয়াসী হয়েছি। কিন্তু যেহেতু লভ্য উপাত্ত পর্যাপ্ত নয়, সুতরাং আমাদের বিশ্লেষণ ও উপসংহারকে সে সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

বিশ্বে অস্ত্রভাণ্ডার ও সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত যে সীমিত সংখ্যক উপাত্ত-উৎস রয়েছে, সেগুলো হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার বার্ষিক প্রকাশনা 'বিশ্ব সামরিক ব্যয় ও অস্ত্র স্থানান্তর,' সুইডেনের আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটের 'বিশ্ব অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও নিরস্ত্রীকরণ: বর্ষগ্রন্থ' আন্তর্জাতিক কৌশলগত সমীক্ষা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রকাশনা 'সামরিক ভারসাম্য' ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের 'সরকারী আয়-ব্যয় পরিসংখ্যানের বর্ষগ্রন্থ।' বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপাত্তগুলো এ সমস্ত উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

২. বিশ্বের অস্ত্রভান্ডার ঃ একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

বর্তমান বিশ্বে অস্ত্রের যে ভান্ডার গড়ে উঠেছে, তাকে মোটা-মুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ ক. আনবিক অস্ত্র, খ. জীবানু ও রাসায়নিক অস্ত্র ও গ. প্রচলিত অস্ত্র। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তিকে ব্যবহার করে যে অস্ত্র তৈরী করা হয়েছে সাধারণভাবে তাই আনবিক অস্ত্র হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৫০ হাজার আনবিক বোমা মজুত রয়েছে বলে প্রাক্‌কলিত হয়েছে। এ বোমাগুলোর মোট বিস্ফোরক শক্তি হিরোশিমায় নিক্ষেপিত আনবিক বোমার তুলনায় প্রায় ১০ লক্ষ গুণ বেশী। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোন নগরীর ওপরে অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের ১০০ কিলোটনের বোমা বিস্ফোরিত হলে তার ৫.৬ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক ঘর-বাড়ী ধুলোয় মিশে যাবে। বিস্ফোরক কেন্দ্রের ২ কিলো-মিটার এলাকার মধ্যে প্রায় সকল প্রাণী প্রচণ্ড বাত্যাবেগ ও সে কারণে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ধাতুর আঘাত, উত্তাপ ও শ্বাসরোধের কারণে মৃত্যুবরণ করবে। যদি আনবিক অস্ত্রের অধিকারী দু'টো দেশের মধ্যকার সংঘর্ষে ১০ হাজার মেগাটন বোমার বিনিময় ঘটে, তা'হলে ১০০ কোটি মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হবে এবং আরও ১০০ কোটি মানুষ গুরুতরভাবে আহত হবে।[১] এ ধরনের আনবিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থাদি ভেঙ্গে পড়বে ; জল, বিদ্যুত, পরিবহণ, উৎপাদন, চিকিৎসা ও বাণিজ্য ব্যবস্থাদির বিলুপ্তি ঘটবে। এক কথায় বলতে গেলে, অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং বাকী অর্ধেকও টিকে থাকবে অর্ধমৃত হয়ে। আনবিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশের ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবীর উদ্ভিদ-জগতের অধিকাংশ বিলুপ্ত হবে, বিষ-দূষণ ও বিলম্বিত তেজষ্ক্রিয়া দেখা দেবে এবং আন্তর-আকাশের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে।

বিগত কয়েক দশকে আনবিক অস্ত্র প্রয়োগের দক্ষতায়ও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। বিশ্বের বর্তমান অস্ত্র ভাণ্ডারে রয়েছে ৩৪৫০ মাইলোর্ধ অঞ্চলে আঘাত হানার জন্যে দূরপাল্লার কৌশলগত অস্ত্র ; ১৩০০ থেকে ৩৪৫০ মাইল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রায় আঘাত করার জন্য অন্তঃবর্তী পাল্লার অস্ত্র ; ৪০০ থেকে ১৩০০ মাইল দূরের এলাকায় আঘাতের জন্য মধ্যপাল্লার অস্ত্র এবং ৪০০ মাইল অবধি অঞ্চলে আঘাত হানার জন্য

কম পাল্লার অস্ত্র।[২]

কিন্তু বর্তমানে আনবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ ও অমানবিক অস্ত্র হচ্ছে জীবানু ও রাসায়নিক অস্ত্র। রাসায়নিক অস্ত্রের দু'টো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য ঃ প্রথমত, যেহেতু বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে এগুলো তৈরী হয়, সেহেতু এর উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল এবং দ্বিতীয়তঃ এর মজুতকরণও সহজসাধ্য। রাসায়নিক অস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হচ্ছে স্নায়ু গ্যাস, যার প্রয়োগে যে কোন প্রাণীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে। পৃথক অবস্থায় তেমন বিষাক্ত নয়, এমন ধরনের দুটি পদার্থ দিয়েও তৈরী করা যায় মারাত্মক রাসায়নিক অস্ত্র, যা যুগল অস্ত্র নামে পরিচিত। জীবানু অস্ত্র রাসায়নিক অস্ত্রের মতই অমানবিক ও ভয়াবহ। উৎস নির্বিশেষে সকল জীবানু অস্ত্রই প্রাণজ জৈব অথবা অধিবিষের ভিত্তিতে তৈরী।

আনবিক, রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র ছাড়াও বর্তমানে বিশ্বে মজুত রয়েছে বিপুল পরিমাণ প্রচলিত অস্ত্র, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাইফেল থেকে রকেট পর্যন্ত। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অস্ত্রেরও ভয়াবহ প্রসার ঘটছে—ভূমিতে রয়েছে সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত গোলা, ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র, রকেট, ট্যাংক প্রভৃতি ; জলভিত্তিক যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে রণতরী, বিমানবাহী সমুদ্রযান ইত্যাদি এবং আকাশ-ভিত্তিক অস্ত্রের মধ্যে যুক্ত হয়েছে অতিকায় ও অতি দ্রুতবেগসম্পন্ন জঙ্গী ও বোমারু বিমান। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অস্ত্রের ক্ষেত্রে ১.৪ মিলিয়ন ট্যাংক,-৩৫ হাজার জঙ্গী বিমান, ২১ হাজার হেলিকপ্টার ও ১১ হাজার ভাসমান যুদ্ধজাহাজ রয়েছে।[৩]

এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কি বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের ভাণ্ডার বর্তমান বিশ্বে গড়ে উঠেছে, যা নিমেষের মধ্যে সারা মানবজাতি এবং তার সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

৩. অস্ত্র ভাণ্ডার, সামরিক ব্যয় ও সম্পদ অপচয় ঃ একটি সমীক্ষা

উপরোল্লেখিত আনবিক ও প্রচলিত অস্ত্রের এ বিপুল বিশ্বভাণ্ডারের সংরক্ষণ, নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবন ও তৈরী এবং এর আনুষঙ্গিক

ব্যয়ের অংক স্বভাবতঃই বিপুল। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত এক হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৮৭ সালে বিশ্বে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯২০ হাজার কোটি ডলার, ১৯৬০ সালে এর পরিমাণ ছিল এ সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং ১৯৪৯ সালে মাত্র ২০ হাজার কোটি ডলার। সামরিক ব্যয়ের এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০০০ সালে বিশ্বে সামরিক ব্যয় হবে ৯৪৮ হাজার কোটি ডলার অর্থাৎ বর্তমান ব্যয়ের প্রায় ৮ গুণ বেশী। অন্যদিকে সামরিক ব্যয় ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রবণতা তীব্র হলে বিশ্বে সামরিক ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট অংকটি ২০০০ সাল নাগাদ ২০০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। টাকায় রূপান্তরিত করলে বিশ্বের বর্তমান সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রতিদিনে ৯ হাজার কোটি টাকা ও প্রতিমাসে ২৯৫ হাজার কোটি টাকা। বিশ্বব্যাপী মাসিক এ সামরিক ব্যয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রায় ৬ গুণ বেশী।[৪]

শুধু অর্থের অংকে নয়, সম্পদের অপচয়ের দিক থেকেও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামরিক ব্যয় প্রচণ্ড রকমের ক্ষতিকর, সামরিক খাতের নিয়মিত ব্যবহারের জন্য সারা বিশ্বে যে পরিমাণ ভূমি বরাদ্দ আছে, তা খুব বেশী নয়। তবে অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য যে ভূমির প্রয়োজন তার আকার নিঃসন্দেহে বিপুল। একটি আনবিক কিংবা রাসায়নিক অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য মাইলের পর মাইল এলাকা জনবসতিহীন করে রাখতে হয়। আর এ-ধরনের পরীক্ষার প্রতিক্রিয়ায় নতুন নতুন এলাকা মানববসতির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের এ বিশ্বে, যেখানে ভূমির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট অথচ এর চাহিদা ক্রমপ্রসারণশীল, সেখানে এ-ধরনের অপচয় তর্কাতীতভাবে দূর্ভাগ্যজনক।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমান সময়ে বিশ্ব-শ্রমের একটি বিরাট অংশ সামরিক খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামরিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মূলতঃ পাঁচটি অংশে ভাগ করা যায় ঃ

ক. সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ঃ সামরিক বাহিনীর বাইরে সাধারণতঃ এদের কোন দায়িত্ব নেই।

খ. সরবরাহকারী শ্রমিক ঃ সামরিক খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ কাজে এরা ব্যবহৃত হয়।

গ. সামরিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ঃ অস্ত্র কারখানাসহ সামরিক

প্রয়োজনে সৃষ্ট শিল্প-কারখানায় এরা কাজ করে।

ঘ. দ্বিতীয় স্তরের সরবরাহকারী শ্রমিকঃ সামরিক খাতের সামগ্রিক অবকাঠামো রক্ষায় এরা অবকাঠামোর বহিরঙ্গে সরবরাহকারীর দায়িত্ব পালন করে।

ঙ. পরোক্ষ শ্রমিকঃ বর্তমান বিশ্বে সামরিকখাতের যে অর্থ-নৈতিক জগত গড়ে উঠেছে, তাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণ এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বর্তমানে বিশ্বে সকল দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের যোগফল প্রায় ২·৫ কোটি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য আরও ১ কোটি। এ ছাড়াও সামরিক খাতের সংযুক্ত শ্রমিকের আওতার মধ্যে রয়েছে ৪০ লক্ষ সরবরাহকারী শ্রমিক, ৫ লক্ষ দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এবং ১ কোটিরও বেশী পরোক্ষ শ্রমিক। এর মানে দাঁড়াচ্ছে বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫ কোটি দক্ষ ও কর্মক্ষম মানুষ তাদের জীবনের সক্রিয় সময়কে ব্যয় করছে সামরিক শ্রমে।[৫]

পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের খনিজসম্পদের অপ্রতুলতা ও জ্বালানী সংকটের কথা সর্বজনবিদিত। অথচ গত কয়েক দশকেই সামরিক শিল্পে এ সকল কাঁচামালের ব্যবহার বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক এ সকল কাঁচামাল বিপুলভাবে ক্রয়ের ফলে অন্যান্য আমদানীকারক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। বিশ্বের মোট তেলের শতকরা ৬ ভাগ, তামার শতকরা ১১ ভাগ, অ্যালুমিনিয়ামের শতকরা ৭ ভাগ, সীসার শতকরা ৮ ভাগ, লোহার শতকরা ৫ ভাগ, প্লাটিনামের শতকরা ৬ ভাগ সামরিক শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বর্তমান খনিজ সম্পদ ও জ্বালানী সংকট আগামী দিনগুলোতে আরও ঘণীভূত হবে।[৬]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা সমাজবিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করেন। বর্তমান সময়ে বিশ্বে গবেষণা-খাতে বার্ষিক আনুমানিক ব্যয় মোট ১০০০ কোটি মাকিন ডলার। কিন্তু এ ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগই অর্থাৎ ৬০০ কোটি মাকিন ডলার ব্যয়িত অস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণায়। বিশ্বে বর্তমানে অস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন ৮ লক্ষেরও বেশী বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী। দক্ষ মানবসম্পদের এ অপ-

ব্যবহার নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত।[৭]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দু'টো প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—এক, কেন এ বিপুল সামরিক ব্যয় এবং দুই, কারা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রথমেই যে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সামরিক খাতের একটি অর্থনৈতিক জগত আছে এবং অস্ত্র নির্মাণ একটি শিল্প। বিভিন্ন সুচকের মাধ্যমে এ শিল্পের একটি বাস্তব পরিধি নির্ণয়ের চেষ্টা আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। যেহেতু অস্ত্র-শস্ত্র একটি পণ্য, অতএব এর একটি বাজার আছে এবং সেই সঙ্গে এর ক্রেতা-বিক্রেতাও রয়েছে। উন্নত দেশগুলোই এ পণ্যের উৎপাদক ও বিক্রেতা এবং অনুন্নত দেশগুলোই এর প্রধান ক্রেতা। বর্তমান সময়ে বিশ্বে সামরিক বাণিজ্যের পরিমাণ বার্ষিক ২৬০০ কোটি ডলার এবং এ বাণিজ্যের ক্রেতাদের শতকরা ৭৫ ভাগই অনুন্নত দেশ। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী বিক্রেতা সব সময়েই তার পণ্যের বাজারের প্রসারণ ঘটাতে চাইবে। ১৯৮১ সালের স্থিরকৃত মূল্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অস্ত্র সরবরাহ ১৯৭২ সালে যেখানে ছিল ১৪০০ কোটি ডলার, ১৯৮২ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ২৮০০ কোটি ডলারে, অর্থাৎ প্রকৃত অংশেই শতকরা ১০০ ভাগ। অস্ত্র সরবরাহ চুক্তির ক্ষেত্র এ বৃদ্ধি আরও বিপুল—১৯৭৩ সালের ১১০০ কোটি ডলার থেকে ১৯৮০ সালে ৪৬০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ শতকরা ৪০০ ভাগেরও বেশী। এর মানে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের অস্ত্রের বাজার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে। উৎপাদক দেশগুলোর জন্য এটা অত্যন্ত মুনাফাজনক।[৮] ১৯৮৩ সালে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিশ্বের দশটি সর্ববৃহৎ অস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তাদের মূলধনের ওপর গড়ে শতকরা ২৫ ভাগ আগম হার অর্জন করেছে, সেখানে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে গড় সংখ্যাটি হচ্ছে শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ। এ অবস্থায় উৎপাদনকারী দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়েই যাবে। সেই সঙ্গে অস্ত্রের বাজারকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা সারা পৃথিবীতে সংঘাত এলাকা জিইয়ে রাখবে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১২০টি সামরিক সংঘাতের ৭০টিই উন্নত বিশ্বের হস্তক্ষেপের কারণে উদ্ভূত ও প্রসারিত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর ১৮ লক্ষ সৈন্য ৭০টি উন্নয়নশীল দেশে অবস্থানরত।[৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে এই দ্রুত বর্ধমান

অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামরিক ব্যয় এবং ফলশ্রুতিতে দ্রুত প্রসারণশীল অস্ত্রের বাজারের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনুন্নত দেশসমূহ। বিশ্বের অস্ত্র বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ক্রেতা যে ২০টি দেশ, তারা উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ হিসেবেই চিহ্নিত। অস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য তারা তাদের সকল রকমের সম্পদ ব্যয় করছে। ফলে এসব দেশের মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ তারা আহরণ করতে পারছে না। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একটি দেশ, যার লোক সংখ্যা ৮৫ লাখের মত এবং মাথাপিছু আয় ৩৫০ ডলারের কাছাকাছি, যদি ২০ কোটি ডলারের অস্ত্র আমদানী করে, তা'হলে এর কারণে সম্পদের যে অপ্রতুলতা দেখা দেবে, তার ফলশ্রুতিতে সে দেশে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ২০ জন বেড়ে যাবে, মানুষের গড় আয়ু ৩/৪ বছর কমে যাবে এবং সাক্ষরতার হার শতকরা ১৩/১৪ ভাগ হ্রাস পাবে। হিসেব করে দেখা গেছে যে তৃতীয় বিশ্বের ঋণভারের শতকরা ২৫ ভাগই অস্ত্র আমদানীর কারণে এবং ১৯৮৩ বৈদেশিক ঋণভারে সবচেয়ে জর্জরিত ২০টি দেশের ৪ টিরই ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বৈদেশিক ঋণভার শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র কারণ অস্ত্র-আমদানী বৃদ্ধি।[১০] সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সারা বিশ্ব জুড়ে বিপুল সামরিক ব্যয়ের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, যাদের সামরিক ব্যয় গত এক দশকে চারগুণ বেড়ে গেছে।

৪ নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন : পারস্পরিক সম্পর্ক

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি কাঠামোগত দিক আছে এবং এর একটি আর্থিক দিক আছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য যেমন সঞ্চয় বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত ও বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে ; তেমনি উন্নয়ন অভিমুখীন একটি ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর প্রাক-উপস্থিতিও অপরিহার্য। নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামরিক ব্যয় কিভাবে উন্নয়নের এ সব পূর্বশর্তকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। এখানে বলে নেয়া ভাল যে অনেকেই সামরিক ব্যয়ের কিছু উন্নয়নমুখী ইতি-

বাচক দিক আছে বলে মনে করেন। কিন্তু এ উপসিদ্ধান্তকে আমরা সরাসরিভাবে প্রত্যাখান করি। আমরা মনে করি, অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলা ও সামরিক ব্যয়ভার বহন সম্পূর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ; এর পেছনে কোন অর্থনৈতিক বিবেচনা নেই। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো সামরিক খাতের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ-ভাবেই অনুৎপাদনশীল, সুতরাং সে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ইতিবাচক প্রভাবের কথা বাতুলতা মাত্র। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে সামরিক ব্যয় যদি অনুৎপাদনশীল হয় এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সামরিক বাণিজ্যের কারণে যদি অনুন্নত দেশগুলোই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তা'হলে এ সব দেশ এ খাতের পেছনে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করছে কেন? এর উত্তর দ্বিমুখী, কিন্তু সংক্ষিপ্ত—প্রথমতঃ এ সব দেশে যে সব সরকার বিদ্যমান এবং তাদের ক্ষমতার উৎস যে সব গোষ্ঠী, তাদের শ্রেণী চরিত্র এমন যে তারা উচ্চতর সামরিক ব্যয় থেকে লাভবান হতে পারে। এটা একদিকে যেমন তাদের ক্ষমতার অধিষ্ঠানকে সংহত করে, তেমনি এ ব্যয় থেকে তারা ঠিকাদারী ও মধ্যস্বত্বভোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র প্রস্তুত ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত উন্নত দেশ-গুলো তাদের অস্ত্রের বাজার নিশ্চিতকরণের জন্য অনুন্নত দেশগুলোকে ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় বহনে বাধ্য করে।

তিনটি প্রধান পন্থায় নিরস্ত্রীকরণ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে : ক. প্রবৃদ্ধির নানান সূচককে পরিবর্তিত করে, খ, পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে এবং গ. সংশ্লিষ্ট দেশের আভ্যন্তরীণ নীতিমালায় বৈদেশিক প্রভাবকে দূরীভূত করে।

নিরস্ত্রীকরণ ও প্রবৃদ্ধি

প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত গড়ে তোলা, যা দেশজ সম্পদ বা বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসবে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী কি বিপুল পরিমাণ সম্পদ সামরিক খাতে ব্যয়িত হয়। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। অনুন্নত দেশগুলোর বাজেটের একটি বড় অংশ সামরিক বাহিনীর পেছনে খরচ করা হয়—এটা যেমন রাজস্ব

বাজেটের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সত্য উৎপাদন বাজেটের ক্ষেত্রে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেটে সামরিক খাতে ১০৪৪ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে ধরা হয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্য খাতে ধরা হয়েছে ৩১৮ কোটি টাকা, জ্বালানী খাতে ৫১ কোটি টাকা, পরিবহন খাতে ৭৮ কোটি টাকা ইত্যাদি।[১১] উন্নয়ন বাজেটেও সরাসরিভাবে কোন সংখ্যা উল্লেখিত না হলেও, সামরিক খাতে ব্যয় প্রবণতা অন্যান্য খাতের চেয়ে বেশী। অন্যান্য অনুন্নত দেশেও সংশ্লিষ্ট চিত্রটি এর চাইতে ভিন্নতর নয়। এ ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে সামরিক বাহিনী.ক বিভিন্নভাবে ভর্তুকী দেয়া হয়, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যভর্তুকী। ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ বাজেটে ৯০ কোটি টাকার খাদ্যভর্তুকীর কথা বলা হয়েছে, যার সিংহভাগই সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য ব্যয়িত হবে। সামগ্রিকভাবে খাদ্যভর্তুকীর পরিমাণ কমানো হলেও নিতান্ত অগ্রাধিকার গোষ্ঠীর, যার বেশীর ভাগ অংশই সামরিক বাহিনীর সদস্যরা, প্রাপ্ত ভর্তুকী মোট ভর্তুকীর প্রায় অর্ধেক। এ ছাড়াও সামরিক খাতে খাদ্য ভর্তুকীকে সামরিক খাতের বাজেটে না দেখিয়ে খাদ্য বাজেটে দেখানো হয় যাতে সামরিক খাতের ব্যয় ভারের বিপুল অংকটি কিছুটা হলেও সংকুচিত হয়।[১২] তবে উপরোক্ত আলোচনায় মূলকথা হল যে অনুন্নত দেশের সীমিত দেশজ সম্পদের একটা বিরাট অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে অর্থনীতির উৎপাদনশীল অংশ পর্যাপ্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এ জাতীয় অবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য। নিরস্ত্রীকরণ সামরিক খাতের ব্যয়ভার কমিয়ে এনে অবমুক্ত বিপুল সম্পদকে, উৎপাদনশীলখাতে প্রবাহিত করবে, যার ফলশ্রুতিতে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।

শুধু দেশজ সম্পদ নয়, বৈদেশিক সাহায্যেরও একটা বড় অংশ অনুন্নত দেশগুলো অস্ত্র আমদানীতে ব্যয় করে। ১৯৮৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলো ৭৫২ কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করেছে, যা ষাটের দশকের আমদানীর প্রায় ৫ গুণ বেশী।[১৩] এ পুরো প্রক্রিয়ার আরও একটি মাত্রিকতা আছে। বিগত বছরগুলোতে সামরিক অনুদানের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে অস্ত্র আমদানী করছে। এর দুটো প্রতিক্রিয়া আছে উন্নয়নের ওপর—প্রথমতঃ

অনুন্নত দেশের সীমিত বৈদেশিক সাহায্য ও দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিরাট অংশ অস্ত্র আমদানীতে ও সামরিক খাতের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয়িত হলে, স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনশীল খাতে এর ঘাটতি দেখা দেবে। দ্বিতীয়তঃ ঋণের মাধ্যমে অস্ত্র আমদানী বৃদ্ধি পেলে অনুন্নত দেশের বৈদেশিক ঋণভার আরও বেড়ে যাবে। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হতে বাধ্য। নিরস্ত্রীকরণ এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের মত ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোও প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনুন্নত দেশে সম্পদের সিংহভাগ যদি সামরিকখাতে ব্যয় করা হয়, তা'হলে এ রকমের একটি দেশে উন্নয়নমুখী একটি অবকাঠামো গড়ে তোলা যাবে না। অথচ নিরস্ত্রীকরণের ফলে সামরিক ব্যয়ভার কমে গেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ পাওয়া যাবে।

গবেষণা ও উন্নয়ন আজকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক শক্তি বলে বিবেচিত হয়। গবেষণা উন্নয়ন ব্যয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে নিশ্চিত করা হয়। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে এ সব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে শুধুমাত্র খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধিই অর্জিত হয় না, বরং সামগ্রিক অর্থনীতিতেও প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করা হয়। অথচ বর্তমান সময়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য মোট যে অর্থ প্রতি বছর ব্যয় করা হয়, তার শতকরা ৬০ ভাগই ব্যয়িত হয় সামরিক খাতের গবেষণায়। নিরস্ত্রীকরণ এ পুরো অর্থকেই উৎপাদনশীল খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে চালিত করবে, যার ফলে এ সব খাতে নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নিশ্চত করবে।[১৪]

নিরস্ত্রীকরণ, পরিবেশ ও উন্নয়ন

পরিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে তা একদিকে যেমন জনবসতির জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। আনবিক, রাসায়নিক ও অন্যান্য ধরনের অস্ত্রের পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের অন্যতম ক্ষেত্রসমূহ একাধিক অনুন্নত দেশে

অবস্থিত। এ জাতীয় পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের ফলে এ সব দেশের বিপুল পরিমাণ ভূমি প্রতি বছর মানব বসতির অযোগ্য হয়ে পড়ছে। অথচ জনসংখ্যার জ্যামিতিক বৃদ্ধির এ সময়ে মানুষের জন্য প্রয়োজন আরও নতুন নতুন সবুজ ভূমি, অস্ত্র পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের ফলে বন ও গাছপালা উজাড় হয়ে যায়, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়, আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত প্রভাবিত হয় এবং সর্বোপরি পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদন প্রচণ্ড-ভাবে হ্রাস পায় যা তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। সুতরাং এ অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণ পরিবেশকে রক্ষা করে এ পৃথিবীকে আগামী যুগের মানুষের জন্য শুধুমাত্র যে বাসযোগ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করে তাই নয়, বরং কৃষিখাতের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

নিরস্ত্রীকরণ, আভ্যন্তরীণ নীতিমালা ও বহিঃহস্তক্ষেপ

অনুন্নত দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ নীতিমালা গ্রহণে যত বেশী স্বাধীনতা থাকবে, ততবেশী সেখানে কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু এ স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয়, যখন এ সব দেশগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত বিশ্বের ওপর পরনির্ভর হয়। কারণ এ জাতীয় পরনির্ভরতা উন্নত দেশগুলোকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়ন, নির্ধারণ ও কার্যকলাপে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়, যে হস্তক্ষেপ এ সব দেশের স্বার্থ-বিরোধী হতে পারে। অনুন্নত বিশ্ব যত বেশী অস্ত্র আমদানী করে—তা সে অনুদানের মাধ্যমেই হোক, কিংবা বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমেই হোক—ততই উন্নত বিশ্বের ওপর তাদের পরনির্ভরতা বাড়ে। এ পরনির্ভরতার সুযোগে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত বিশ্বের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করে যাতে উন্নত বিশ্বের স্বার্থসিদ্ধি হয় ঠিকই, কিন্তু তা অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়। নিরস্ত্রী-করণ এ পরনির্ভরতা দূর করে অনুন্নত দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়ন ও গ্রহণে স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, যা এ সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রায় ৭০টি অনুন্নত দেশে সমীক্ষা পরিচালনা করে দেখা গেছে যে,

ক. অস্ত্রখাতে ব্যয় বৃদ্ধি সে সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং তাদের জনগণের ওপর করের বোঝা বেড়েছে,

খ. অস্ত্র-আমদানীর ফলে তাদের জনজীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট দেখা দিয়েছে,

গ. অস্ত্রখাতে বিপুল অর্থব্যয়ের ফলে এ সব দেশসমূহে কাঙ্খিত পুঁজিগঠন সম্ভব হচ্ছে না,

ঘ. এ সব দেশগুলো প্রযুক্তি ও শিল্পের ক্ষেত্রে কখনোই 'স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে না, ও

ঙ. অস্ত্রদাতা দেশসমূহ অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে।

৫. সীমিত নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন : একটি সম্ভাব্য চিত্র

নিরস্ত্রীকরণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কিভাবে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে, তার একটি তত্ত্বীয় আলোচনা আমরা এ অংশের পূর্বগামী অংশে করেছি। বাস্তব দিক থেকেও নিরস্ত্রীকরণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কি ভাবে প্রভাবিত করে, তার একটি সম্ভাব্য চিত্র এ অংশে দিতে আমরা প্রয়াসী হব। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করলে পুরো বিশ্বের অর্থনৈতিক রূপ নিঃসন্দেহে আমূল পরিবর্তিত হবে। কিন্তু পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাব্যতা বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু সীমিত নিরস্ত্রীকরণের কথাও চিন্তা করি, তা'হলেই আমরা দেখতে পাব সীমিত নিরস্ত্রীকরণের দ্বারা অবমুক্ত সম্পদ ব্যবহারে সমগ্র বিশ্বে, বিশেষতঃ অনুন্নত দেশ গুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি প্রভূত পরিমাণে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সীমিত নিরস্ত্রীকরণের দ্বারাই সারা বিশ্বে অস্ত্রখাত থেকে ২০০০ সালে বছরে ৩৭১ হাজার কোটি ডলার বাঁচানো সম্ভব হবে। অস্ত্রখাতে বাঁচানো এ অর্থ উৎপাদনশীল ও উন্নয়নখাতে ব্যয় করলে যে সুফল পাওয়া যেতে পারে, তারও চিত্র

পাওয়া যায় বিভিন্ন গবেষণার সমন্বিতরূপে। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো হল ঃ

ক. এর ফলে বিশ্বব্যাপী গড় জাতীয় আয় ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে,

খ. বিশ্বব্যাপী পুঁজি বৃদ্ধি পাবে ৫.৩ শতাংশ ও

গ. বিশ্বের কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাবে ৪.৬ শতাংশ।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য চিত্রটি আরও আশাব্যঞ্জক, সীমিত নিরস্ত্রীকরণের ফলে এ সব দেশে

ক. মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৭ শতাংশ (লাতিন আমেরিকার সম্পদ-অপ্রতুল দেশসমূহে) থেকে ১৪৭ শতাংশ (আফ্রিকার কতিপয় দেশে) বৃদ্ধি পাবে,

খ. পুঁজি বৃদ্ধি পাবে ১৬ শতাংশ থেকে ১৩৭ শতাংশ ও

গ. শিল্পখাতে ১০ শতাংশ থেকে ১৩৪ শতাংশ নতুন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।[১৫]

এ সব দেশসমূহ যদি ১৯৭২-৮২ সালের মধ্যে কোন অস্ত্র না ক্রয় করত, তা'হলে তাদের বৈদেশিক ঋণ প্রতিবছর শতকরা ২০ ভাগ কমে যেত এবং এ সময়কালের শেষে তাদের গচ্ছিত ঋণ শতকরা ১৫ ভাগ কম হত।[১৬]

২০০০ সাল নাগাদ যদি বিশ্বে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হয়, তা'হলে সারা বিশ্বে মাথাপিছু আয় শতকরা ৪০ ভাগ, মজুত পুঁজি শতকরা ৩৮ ভাগ ও শিল্প শ্রমিকের কর্মসংস্থান শতকরা ৩২ ভাগ বেড়ে যাবে। এর ফলশ্রুতিতে এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।[১৭] উপরোক্ত চিত্রসমূহ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, নিরস্ত্রীকরণের সুফল তুলনামূলকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রেই বেশী হবে, যা এ উপসিদ্ধান্তকেই আবারও প্রমাণ করে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ের ফলে এ সব দেশগুলোই তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৬. উপসংহার

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা সবাই বলছি, কিন্তু

আমাদের অনেকেরই মনে ধারণা রয়েছে যে নিরস্ত্রীকরণ মানেই বিশ্বের দুই পরাশক্তির অস্ত্রভাণ্ডার ও সামরিক ব্যয় হ্রাস এবং তাদের অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি সম্পাদন। আমরা এও মনে করি যে এটা হলে পরেই নিরস্ত্রীকরণ অর্জিত হয়ে গেল। এ জাতীয় ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। মনে রাখতে হবে অস্ত্র একটি পণ্য এবং তার একটি সংগঠিত বাজার আছে। নিরস্ত্রীকরণের আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে সে বাজারের সংকোচন। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে পণ্য বিক্রেতা তার বাজারের সংকোচন চাইবে না। অতএব এ দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে বর্তায় ক্রেতার ওপর। অস্ত্র বাজারে মূল ক্রেতা হচ্ছে অনুন্নত দেশ-গুলো। সুতরাং তারা যদি তাদের চাহিদা সংকোচন করে, তা'হলেই কেবল এ বাজার সংকুচিত হতে পারে। কিন্তু এ সব দেশে যারা ক্ষমতায় আসীন, তারা তাদের নিজের স্বার্থেই এ জাতীয় সংকোচন চাইবে না, বরং অস্ত্র-বাজারের প্রসারণই তাদের স্বার্থের অনুকূল হবে। এ অবস্থায় একমাত্র এ সব দেশের জনগণ যদি অস্ত্র প্রতি-যোগিতা ও সামরিক ব্যয় সংকোচনের জন্য স্ব স্ব দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং নিরস্ত্রীকরণের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলে, তা'হলেই কেবল অনুন্নত দেশের সরকারসমূহ তাদের অস্ত্র চাহিদা ও সামরিক ব্যয় হ্রাস করবেই। সফল নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রমুক্ত একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সেটাই একমাত্র কার্যকরী পথ।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Stockholm International Peace Research Institute (198?), *World Armament and Disarmament SIPRI Yearbook*, Stockholm, June.

২. প্রাগুক্ত

৩. Us Arms Control and Disarmament Agency (1988), *World Military Expenditures and Transfers*. Washington D. C.

৪. প্রাগুক্ত

৫. International Institute of Strategic Studies (1988) *The Military Balance*, July.

৬. প্রাগুক্ত

৭. Smith, D. and R, Smith (1988) *The Economics of Milita-*

rism (Second Edition), London, Pluto Press.
৮. Daeger, S (1985) *Military Expenditure in the Third World : The Economic Effects*, London. Routledge and Kegan Paul.
৯. Thorsson, I. (1985), Disarmament and Development : An Idea Whose Time Should Have Come, *IDS Bulleten*. vol. 4, No. 6, Institute of Development Studies, Sussex
১০. Brzoska, M (1983), 'The Military Related Delet of Third World Countries,' *Journal of Peace Research*, vol. 20, No. 3
১১. Government of Bangladesh (1988), *Budget Speech by the Finance Minister*, June, Dhaka
১২. প্রাগুক্ত
১৩. Brzoska (1983), পূর্বোল্লেখিত
১৪. Smith et. al. (1988), পূর্বোল্লেখিত
১৫, Faini, P. et. al. (1984), 'Defence Spending, Economic Struce and Growth : Evidence Among Countries and Over Time,' *Economic Development and Cultural Change*, vol, 32, April
১৬. Brzoska (1983), পূর্বোল্লেখিত
১৭. Faini, P. et. al (1984), পূর্বোল্লেখিত